**একটি সংখ্যার গল্প**

**প্রথম অধ্যায়ঃ জন ন্যাপিয়ার, ১৬১৪**

Seeing there is nothing that is so troublesome to

mathematical practice, nor that doth more molest and

hinder calculators, than the multiplications, divisions,

square and cubical extractions ofgreat numbers. ...

**1** began therefore to consider in my mind by what cenain

and ready an **1** might remove those hindrances.

**-**JOHN NAPIER, Mirifici logarithmorum canonis

descriptio (**1614)1**

**বিজ্ঞানের ইতিহাসে লগারিদমের আবিষ্কার একটি দূর্লভ স্থান অধিকার করে আছে। বিমূর্ত কোনো গাণিতিক ধারণাকে এর আগে কখনও সকল বিজ্ঞানী এতটা উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেননি। আবিষ্কারের কৃতিত্বের মালিক জন ন্যাপিয়ার২। এই আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে কম সম্ভাব্য কারো কথা কল্পনা করাও কঠিন।**

**বাবার নাম স্যার আর্চিবাল্ড ন্যাপিয়ার, আর মায়ের নাম জ্যানেট বোথওয়েল। স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গের কাছে পারিবারিক বাড়ি মারচিস্টন ক্যাসলে ১৫৫০ সালে তাঁর জন্ম (প্রকৃত তারিখ কারো জানা নেই)। প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তের বছর বয়সে তাঁকে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। পড়াশোনা করেন ধর্ম নিয়ে। বিদেশে কিছু কাল অবস্থা করার পর ১৫৭১ সালে দেশে ফিরে আসেন। বিয়ে করেন এলিজাবেথ স্টারলিং-কে। এ দম্পতি ছিল দুটি সন্তান। ১৫৭৯ সালে এ স্ত্রী মারা যান। এবার তিনি বিয়ে করেন অ্যাগ্নেস সিজল্ম-কে। এখানে তাঁর আরও দশটি সন্তান হয়। এ ঘরের দ্বিতীয় পুত্র রবার্ট পরবর্তীতে তাঁর গবেষণার কপিরাইট লাভ করেন। ১৬০৮ সালে স্যার আর্চিবাল্ড মারা গেলে জন মার্চিস্টন ফিরে আসেন। এখানেই কাটিয়ে দেন বাকী জীবন। এ সময় তিনি পারিবারিক ভূ-সম্পত্তির অষ্টম জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন৩।**

**প্রথম জীবনে গণিতের দিকে তাঁর আগ্রহ কমই ছিল। ফলে ভবিষ্যতে যে গণিতে তিনি সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখবেন তা আঁচ করা মুশকিল ছিল। তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল ধর্মে, বা বলা চলে ধর্মীয় কার্যক্রমে। ছিলেন নিষ্ঠাবান প্রোটেস্ট্যান্ট। পোপদের কতৃত্বের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি *আ প্লেইন ডিসকভারি অব দ্যা হোল রিভিলেশন অব সেন্ট জন* বইয়ে তাঁর মত প্রকাশ করেন। এতে তিনি ক্যাথলিক গীর্জাকে তীব্র আক্রমণ করেন। দাবি করেন, পোপই হচ্ছেন অ্যান্টিক্রাইস্ট। তিনি স্কটিশ রাজা ৬ষ্ঠ জেমসকে (যিনি পরে ১ম জেমস নামে ইংল্যান্ডের রাজা হন) অনুরোধ করেন যাতে তিনি তাঁর দরবার ও প্রাসাদ থেকে সকল ক্যাথলিক, নাস্তিক ও** newtral **দের বের করে দেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ১৬৮৮ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। বইটির ২১টি সংস্করণ বের হয় (এর মধ্যে দশটি বের হয় তিনি বেঁচে থাকতেই)। অনূদিত হয় অনেকগুলো ভাষায়। এতে করে ন্যাপিয়ারের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মে যে ইতিহাসে (অন্তত যে অল্প কয়টি দিন সামনে বাকী ছিল তাতে) তাঁর নাম স্থায়ী হয়ে গেল।**

**তবে ন্যাপিয়ারের আগ্রহ ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জমির মালিক হিসেবে নিয়মিত চেষ্টা করতেন, কীভাবে শস্য ও গবাদি পশুর উন্নতি করা যায়। মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সার ও লবণ নিয়ে পরীক্ষা চালাতেন। ১৫৭৯ সালে তিনি একটি হাইড্রোলিক স্ক্রু তৈরি করেন। এর সাহায্যে কয়লার গর্তের পানির স্তর নিয়ন্ত্রণ করা যেত। সামরিক কার্যক্রমেও তাঁর আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে এর পেছনে কারণ হল, স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপ ইংল্যান্ড আক্রমণ করবেন এমন একটি আশঙ্কা সবার মধ্যে ছিল। শত্রুর জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি বড় বড় দর্পণ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এটা মনে করিয়ে দেয় আর্কিমিডিসের কথা, যিনি আঠারো শ বছর আগে সিরাকিউসের প্রতিরক্ষায় একই পরিকল্পনা করেন। এছাড়াও তিনি এমন একটি কামানের কথা চিন্তা করেন, যেটি চার মাইল পরিধির মধ্যে থাকা এক ফুটের বড় সব জীবিত প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারবে। পরিকল্পনা করেন একটি ঘোড়ার গাড়ির কথা, যেটি সামনে একটি a** chariot

with "a moving mouth of mettle" that would "scatter destruction

on all sides," and even a device for "sayling under water, with divers

and other stratagems for harming of the enemyes"-all forerunners of

modern military technology.5 It is not known whether any of these

machines was actually built.

**এত বিচিত্র আগ্রহের অধিকারী মানুষদের ক্ষেত্রে যা হয় তাই ঘটল। অনেকগুলো কাহিনির অংশ হয়ে গেলেন তিনি। এবং মনে হচ্ছে তিনি খানিকটা ঝগড়াটেও ছিলেন। মাঝেমাঝেই প্রতিবেশি ও প্রজাদের সাথে ঝগড়া লেগে যেত। একটি কাহিনি অনুসারে, এক বার এক প্রতিবেশির কবুতর ন্যাপিয়ারের জমিতে নেমে শস্যকণা খেয়ে ফেললে তিনি খুব রেগে যান। প্রতিবেশিকে সতর্ক করে দেন, কবুতরগুলোকে না থামালে তিনি তাদেরকে ধরে রেখে দেবেন। প্রতিবেশি ধৃষ্টাতা দেখিয়ে এই হুমকি অবজ্ঞা করেন। বলে দেন, ন্যাপিয়ার চাইলেই কবুতরদের ধরে রাখতে পারে। পরের দিন প্রতিবেশি দেখলেন, ন্যাপিয়ারের উঠোনে কবুতরগুলো অর্ধ-মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ন্যাপিয়ার আসলে খুব বেশি কিছু করেননি। শুধু শস্যকনাকে শক্তিশালী স্পিরিট দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পাখিগুলো নেশাগ্রস্থ হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে।**

**আরেকটি কাহিনি অনুসারে, ন্যাপিয়ারের মনে হয়েছিল, তাঁর একজন চাকর তাঁর কিছু জিনিস চুরি করছে। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর পোষা কালো মোরগটিই চোরকে শনাক্ত করবে। সকল চাকরকে একটি অন্ধকার কক্ষে ডেকে নিয়ে মোরগের পিঠে হালকা চাপড় দিতে বললেন। চাকরদের অজ্ঞাতসারে তিনি মোরগের পিঠে প্রদীপের কালি মেখে রাখেন। কক্ষ থেকে বের হবার সময় সব চাকরকে হাত দেখাতে নির্দেশ দিলেন। অপরাধী চাকরটি ভয় পেয়ে মোরগকে স্পর্শই করেনি। ফলে পরিষ্কার হাত দেখিয়ে সে ধরা পড়ে গেল।৬**

**ন্যাপিয়ারের এসব কর্মকাণ্ডের কথা এখন সবাই ভুলে গেছে, এমনকি নিষ্ঠার সাথে পালিত তাঁর ধর্মীয় তৎপরতাগুলোও। ইতিহাসে যদি তাঁর নাম স্থায়ী হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটি তাঁর বেস্ট-সেলিং বই বা যান্ত্রিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার জন্যে নয়। সেটা হয়েছে বরং বিশ বছর ধরে তৈরি করা একটি বিমূর্ত গাণিতিক ধারণার জন্যে। এটাই হল লগারিদম।**

**-০-**

**ষোলো শতক এবং সতের শতকের শুরুতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত প্রাচীন ভুল ধারণাগুলো দূর হওয়াতে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা দ্রুত পাল্টে গেল। গীর্জার অনুশাসনের সাথে প্রায় এক শতক ধরে লড়াই করে অবশেষে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ স্বীকৃত হতে লাগল। ১৫২১ সালে ম্যাজেলান পুরো পৃথিবী ঘুরে আসার মাধ্যমে সামুদ্রিক অভিযানের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা ঘটে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্ত মানুষের পদাচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৫৬৯ সালে গেরার্ড মার্কেটর তাঁর বিখ্যাত নতুন\*১ বিশ্ব মানচিত্র প্রকাশ করেন। নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে এই ঘটনা মূখ্য** **ভূমিকা পালন করে।**

**ও দিকে ইতালিতে গ্যালিলিও বলবিদ্যার ভিত্তি তৈরি করছিলেন। জার্মানির কেপলার তাঁর গ্রহের তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন, যার ফলে গ্রিকদের ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের সব ধরনের ধারণা থেকে জ্যোতির্বিদ্যার মুক্তি ঘটে। এই উন্নতিগুলো করতে গিয়ে ক্রমেই বেশি বেশি গাণিতিক হিসাব-নিকাশের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ফলে বিজ্ঞানীদেরকে বড় বড় হিসাব করতে গিয়ে অনেক সময় ব্যয় করতে হত। সময়ের প্রয়োজনেই দরকার ছিল এমন একটি আবিষ্কার, যা বিজ্ঞানীদেরকে এই বোঝা থেকে মুক্ত করবে। চ্যালেঞ্জটি নিলেন ন্যাপিয়ার।**

**কোন ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যাপিয়ার শেষ পর্যন্ত এই আবিষ্কার করেন তা সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো বিবরণ নেই। তিনি ত্রিকোণমিতি ভালো পারতেন এবং এই সূত্রটিও নিশ্চয়ই জানতেনঃ**

sinA . sinB = **1/2[**cos(A - B) - cos(A + B)]

**এই সূত্র এবং** cos A . cosB **এবং** sin A . cos B **এর জন্যে একই ধরনের সূত্রগুলো *প্রোস্থ্যাপ্যারেটিক রুল* নামে পরিচিত ছিল। গ্রিক এই কথাটির অর্থ হল *যোগ ও বিয়োগ*। এদের গুরুত্ব হল, এর মতো দুটি ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফলকে অন্য রাশির যোগ বা বিয়োগ বের করেই হিসাব করে ফেলা সম্ভব। যেমন ওপরের সূত্রে** sinA . sinB **গুণফলটি জানার জন্যে আপনাকে** cos(A - B) **ও** cos(A + B) **এর বিয়োগফল বের করাই যথেষ্ট। গুণ ও ভাগ করার চেয়ে যোগ-বিয়োগ করা সহজ। এ কারণে এক গাণিতিক অপারেশনকে\*২ আরেকটির মাধ্যমে সহজে করে ফেলার জন্যে এই সূত্রগুলো একটি পুরনো কৌশল। হয়ত এই ধারণাই ন্যাপিয়ারকে সঠিক পথ বাতলে দেয়।**

**দ্বিতীয় আরেকটি ধারণা ছিল আরো বেশি প্রত্যক্ষ। এটা হল জ্যামিতিক অনুক্রম, যেখানে পর্যায়ক্রমিক সংখ্যাগুলো একই অনুপাতে বড় হতে থাকে। যেমন, ১, ২, ৪, ৮, ১৬,... ক্রমটি একটি জ্যামিতিক অনুক্রম। এখনে নির্দিষ্ট অনুপাত (প্রচলিত নাম *সাধারণ অনুপাত*) হল ২। আমরা যদি নির্দিষ্ট অনুপাতকে** q **দ্বারা প্রকাশ করি, তাহলে ১ থেকে শুরু করলে অনুক্রমটির পদ্গুলো হবে ১,** q, q**২**, q**৩** **ইত্যাদি (খেয়াল করুন** n**তম পদ হবে** qn-1**)। ন্যাপিয়ারের সময়কালের অনেক আগেই দেখা গিয়েছিল, জ্যামিতিক অনুক্রমের পদ্গুলোর সাথে তাদের সাধারণ অনুপাত সূচকের একটি স্পষ্ট সম্পর্ক আছে।**

**জার্মান গণিতবিদ মাইকেল স্টাইফেল (১৪৮৭-১৫৬৭) তাঁর *অ্যারিথমেটিকা ইনটিগ্রা* বইয়ে (১৫৪৪) সম্পর্কটিকে এভাবে তুলে ধরেনঃ আমরা যদি ১,** q, q**২ ...অনুক্রমের যে কোনো দুটি পদকে গুণ করি অথবা পদ দুটির ঘাত যোগ করি, তবে দু ক্ষেত্রে ফলাফল একই পাই।৭ যেমন** q2 . q3 = **(**q. q) . (q . q . q) =q . q . q . q . q =q5, **যে ফলাফল খুব সহজেই পাওয়া যেত ২ ও ৩ ঘাত দুটিকে যোগ করেই।\*৩ একইভাবে একটি জ্যামিতিক অনুক্রমকে আরেকটি দ্বারা ভাগ করা আর তাদের ঘাত বিয়োগ করাও একই কথা।** q5/q3=(q . q . q . q . q)/(q . q . q) =q . q = q2 =qS-3। **ফলে আমরা একটি সরল সূত্র পেলামঃ**

qm . qn =qm+n **আর** qm/qn = qm-n**।**

**কিন্তু একটি সমস্যা তৈরি হল। লবের চেয়ে হরের ঘাত যদি বড় হয়? যেমন q3/q5। আগের নিয়ম মেনে নিলে আমরা পাব q3-S = q-2। আমরা কিন্তু একে সংজ্ঞায়িত করিনি। এর সমাধানের জন্যে আমরা q-n কে l/q"হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। ফলে,**

**q3-5 =q-2 = l/q2। q3 কে q5 দ্বারা সরাসরি ভাগ করে পাওয়া ফলাফলের সাথে এই মান পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।৮ (এখানে মনে রাখতে হবে, qm /q" =** **qm –n নিয়মটিকে ঠিক রাখতে হলে আমাদেরকে আরেকটি জিনিসের সংজ্ঞা ঠিক করতে হবে। এটি হল, m =n হলে q0 =1 হবে। সংজ্ঞাগুলো মাথায় রেখে এবার আমরা জ্যামিতিক অনুক্রমকে দুদিকেই ইচ্ছেমতো বিস্তৃত করতে পারি। ... , q-3, q-2, q-I, q0 = 1, q, q2, q3, ...। আমরা দেখছি, প্রতিটি পদই একটি কমন রাশি q এর সূচক। আবার ... , -3, -2,-1, 0, 1, 2, 3, ...সূচকগুলোও একটি গাণিতিক অনুক্রম\*৪ তৈরি করে (গাণিতিক অনুক্রমে ক্রমিক পদ্গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে পার্থক্য হল ১)। লগারিদমের ধারণা তৈরির পেছনে এ সম্পর্কই মূল ভূমিকা পালন করেছে। স্টাইফেল সূচক হিসেবে শুধু পূর্ণ সংখ্যার কথাই চিন্তা করেছেন। কিন্তু ন্যাপিয়ার সম্পর্ক্টিকে বিস্তৃত করে অবিচ্ছিন্ন\*৫ মানের ধারণাও নিয়ে আসেন।**

**চলুন দেখি, তিনি আসলে কী ভাবছিলেনঃ যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার (যাকে আমরা পরে ভিত্তি (base)বলব) সূচক আকারে লিখতে পারি, তাহলে বিভিন্ন সংখ্যার গুণ ও ভাগ তাদের সূচকের যোগ বিয়োগ করেই পাওয়া যাবে। আবার কোনো সংখ্যার ঘাত n পর্যন্ত উঠানো (মানে একে নিজের সাথে n বার গুণ করা) আর সংখ্যাটির সূচককে নিজের সাথে n বার যোগ করা (মানে n দ্বারা গুণ করা) একই কথা। আর কোনো সংখ্যার n তম মূল নেওয়া আর ক্রমিকভাবে n বার বিয়োগ (মানে n দ্বারা ভাগ) দেওয়া একই কথা। সোজা কথায়, প্রতিটি গাণিতিক অপারেশন এর নিচের ক্রমিক অপারেশনের আওতায় চলে আসবে। ফলে সংখ্যা নিয়ে হিসাব-নিকাশের খাটুনি কমে যাবে\*৬।**

**২ সংখ্যাটিকে ভিত্তি হিসেবে চিন্তা করে দেখি বুদ্ধিটা কীভাবে কাজ করে। ১.১ নং সারণিতে ২ এর সূচকগুলো পরপর দেওয়া আছে। n =-3 থেকে শুরু করে n=12 পর্যন্ত। ধরুন আমরা ৩২ কে ১২৮ দ্বারা ভাগ করতে চাই। আমরা সারণি থেকে ৩২ ও ১২৮ এর সূচক দেখে নেব। এরা হলো যথাক্রমে ৫ ও ৭। সূচক দুটি যোগ করে হয় ১২। এবার উল্টো দিকে যেতে হবে। দেখতে হবে ১২ কোন সংখ্যার সূচক। সংখ্যাটি হলো ৪,০৯৬। এটাই উত্তর। আরেকটি উদাহরণ দেই। মনে করুন আমরা 45 এর মান বের করতে চাই। আমাদেরকে ৪ এর সূচক দেখতে হবে। এটা হলো ২। একে ৫ এর সাথে গুণ করে পাব ১০। এবার দেখতে হবে কোন সংখ্যার সূচক ১০ হয়। দেখা গেল, সেটি হলো ১,০২৪। আর আসলেই 45 =(22)5 =210 = 1,024।**

**সারণি ১.১- ২ এর ঘাতসমূহ**

**(পৃ ২০)**

**হ্যাঁ, পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে গেলে এমন ঘোরানো পদ্ধতির দরকার নেই। এটা বাস্তবে কাজে লাগবে, যদি যে কোনো সংখ্যার জন্যে একে ব্যবহার করা যায়। হোক তা পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশ। কিন্তু সেটা করতে হলে আগে আমাদেরকে টেবিলের সংখ্যাগুলোর মাঝের বিশাল গ্যাপ পূরণ করতে হবে। এটা দুইভাবে হতে পারে। একটি উপায় হলো, সূচকের ভগ্নাংশ ব্যবহার করা। আরেকটি উপায় হলো, ভিত্তি হিসেবে এমন একটি সংখ্যা বাছাই করা, যেটা এতটা ক্ষুদ্র যে এর ঘাত লক্ষ্যণীয় রকম ধীরে বাড়বে। সূচকের ভগ্নাংশের সংজ্ঞা হলো**

am/n = n√am(**যেমন** 25/3 = 3√25= 3 √32 ≈ 3.17480)**।** **নেপিয়ারের সময়৯ এটা পুরোপুরি জানা ছিল না। বাধ্য হয়েই তাঁকে দ্বিতীয় কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু ভিত্তিকে ঠিক কতটুকু ছোট নেওয়া উচিৎ? সহজেই বোঝা যাচ্ছে, ভিত্তি খুব ছোট হলে এর ঘাতও (পাওয়ার) ধীরে ধীরে বড় হবে। ফলে এ পদ্ধতি বাস্তবে খুব বেশি কাজে আসবে না। তখন মনে হলো, ১ এর কাছাকাছি একটি সংখ্যা নিলে মোটামুটি চলবে। তবে খুব বেশি কাছে হওয়া যাবে না। বহু বছর এ সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকেন নেপিয়ার। এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন, ভিত্তি হবে ০.৯৯৯৯৯৯৯ বা ১-১০-৭।**

**কিন্তু এ নির্দিষ্ট সংখ্যাটিই কেন নিলেন তিনি? মনে হয়, তিনি দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। অবশ্য, নেপিয়ারের সময়কালের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই দশমিকের ব্যবহার ছিল। তবে প্রায় সর্বদাই সাধারণ ভগ্নাংশ, মানে পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত-ই শুধু ব্যবহৃত হত। আমাদের দশ ভিত্তিক গণনা পদ্ধতিকে ১ এর ছোট সংখ্যার জন্য প্রয়োগ করার নাম দশমিক ভগ্নাংশ। এ পদ্ধতি তখন মাত্র ক’দিন আগে ইউরোপে পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষ তখনও একে সেভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ব্যবহার কমাতে নেপিয়ার একটি উপায় বের করলেন। এক ডলারকে এক শ সেন্ট বা এক কিলোমিটারকে এক হাজার মিটার করার জন্যে আমরা যে কৌশলের আশ্রয় নেই, সেটাই করলেন তিনি। তিনি এককটিকে অনেকগুলো উপ-এককে বিভক্ত করলেন, যার প্রতিটিকে আলাদা এক একটি একক হিসেবে বিবেচনা করলেন। যেহেতু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বড় বড় ত্রিকোণমিতিক হিসাব-নিকাশের পরিশ্রম এড়ানো, তাই তিনি সে সময় ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত পথটিই ধরলেন। আর তা হলো, একটি একক বৃত্তের (**Unit circle) **ব্যাসার্ধকে এক কোটি বা ১০৭ অংশে ভাগ করতে হবে। অতএব আমরা পূর্ণ একক থেকে এর ১০৭তম একক বাদ দিলে ১ এর নিকটতম সংখ্যাটি পাব। তার মানে ১-১০-৭ বা ০.৯৯৯৯৯৯৯। সারণি তৈরির জন্যে নেপিয়ার শেষ পর্যন্ত এ সাধারণ অনুপাতটিই (**common ratio**, নেপিয়ার একে বলতেন** proportion**। বাংলায় অবশ্য দুটোর অর্থই অনুপাত। যদিও প্রয়োগ ভিন্ন ক্ষেত্রে)।**

**এবার নামলেন পরের ক্লান্তিকর কাজটিতে। এ অনুক্রমের ধারবাহিক পদ্গুলো একের পর এক বিয়োগ দিয়ে দিয়ে বের করতে লাগলেন। একজন বিজ্ঞানীর জন্যে এর চেয়ে বিরক্তিকর কাজ আর থাকতে পারে না। কিন্তু নেপিয়ার থামলেন না। কাজটি শেষ করার জন্যে কুরবানি করলেন জীবনের বিশটি বছর (১৫৯৪-১৬১৪)। তাঁর বানানো প্রথম সারণিতে মাত্র ১০১টি সংখ্যা ছিল। প্রথমটি ছিল ১০৭ বা ১০,০০০,০০০। পরেরটি ছিল ১০৭(১-১০-৭) বা ৯,৯৯৯,৯৯৯ ও ১০৭(১-১০-৭)২ বা ৯,৯৯৯,৯৯৮ ইত্যাদি। আর শেষ পদটি ছিল ১০৭(১-১০-৭)১০০ বা ৯,৯৯৯,৯০০ (০.০০০৪৯৫০ এই ভগ্নাংশ অংশটিকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে)। প্রতিটি পদ বের করা হয়েছে এর আগের পদ থেকে তার ১০৭তম অংশ বাদ দিয়ে।**

**এর পর তিনি পুরো প্রকিয়াটি আবার নতুন করে করেন। তবে এবার অনুপাত হিসেবে নিলেন মূল সারণির সর্বশেষ সংখ্যাকে প্রথম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে। তার মানে ৯,৯৯৯,৯০০:১০,০০০,০০০ = ০.৯৯৯৯৯ বা ১-১০-৫। দ্বিতীয় এই সারণিতে মান ছিল ৫০টি। শেষটি হলো ১০৭(১-১০-৫)৫০ , যা ৯,৯৯৫,০০১ এর খুব কাছাকাছি। এর পরে বানালেন তৃতীয় আরেকটি সারণি। এতে ছিল ২১টি মান। এতে ব্যবহার করা অনুপাতটি ছিল ৯,৯৯৫,০০১:১০,০০০,০০০। এ সারণির সর্বশেষ মান ছিল ১০৭ × ০.৯৯৫২০ বা প্রায় ৯,৯০০,৪৭৩। শেষে এই সর্বশেষ সারণির প্রতিটি মান থেকে নেপিয়ার আরও ৬৮টি বাড়তি মান তৈরি করেন। এক্ষেত্রে অনুপাত হলো ৯,৯০০,৪৭৩:১০,০০০,০০০, যা ০.৯৯ এর খুব কাছাকাছি মান। এবার শেষ সংখ্যাটি দাঁড়াল ৯,৯০০,৪৭৩×০.৯৯৬৮। এটা ৪,৯৯৮,৬০৯ এর খুব কাছাকাছি। মানে, মূল সংখ্যাটির প্রায় অর্ধেক।**

**বর্তমান যুগে এমন একটি কাজ কম্পিউটার দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে। পকেট ক্যালকুলেটর দিয়েও এ কাজটি কয়েক ঘণ্টায় করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু নেপিয়ার কাগজ আর কলম ব্যবহার করেই কাজটি করেছিলেন। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, দশমিক ভগ্নাংশের ব্যাবহার কমিয়ে আনতে তিনি কতাটা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয় সারণির প্রথম ও শেষ সংখ্যা যথাক্রমে ১০,০০০,০০০.০০০০০ ও ৯৯৯৫০০১.২২২৯২৭। এদের অনুপাতটি সুবিধাজনক সংখ্যা নয়। তাই অনুক্রমটি তৈরির সময় ১০০০০ ও ৯৯৯৫ এর ব্যবহার করলে সুবিধা হয়। এটা ঐ অনুপাতটির যথেষ্ট কাছাকাছি। এখন যদি নির্ভুলভাবে হিসাব করা যায়, তাহলে শেষ পদটি হবে ৯৯০০৪৭৩.৫৭৮০৮।‘**

**দুরূহ কাজটি শেষ করার পর এবার নেপিয়ারের কাজ হলো এর একটি নাম দেওয়া। তিনি প্রথমে প্রতিটি ঘাতের সূচককে নাম দিলেন এর ‘কৃত্রিম সংখ্যা’ (**Articficial number)**। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে নাম দিলেন লগারিদম। এর অর্থ হলো আনুপাতিক সংখ্যা। চিহ্নের আধুনিক প্রথা অনুসারে এ কথা বলার মানে হলো, যদি (তাঁর প্রথম সারণিতে)** N = 107(1-10-7)L **হয়, তাহলে L সূচকটি হলো N এর (নেপিয়ারীয়) লগারিদম। নেপিয়ার লগারিদমের যে সংজ্ঞা দেন, সেটি আধুনিক সংজ্ঞা (যেটা ১৭২৮ সালে লিওনার্দ অয়লার শুরু করেন) থেকে কয়েকভাবে আলাদা। সেটা অনুসারে যদি N = bL হয়, তবে L হচ্ছে N এর (b ভিত্তিক) লগারিদম, যেখানে b হলো ১ ছাড়া যেকোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। তার অর্থ হলো, নেপিয়ারের পদ্ধতিতে L = 0 হলে N = 107 হয়। তার মানে Nap log107 = 0। অন্য দিকে আধুনিক পদ্ধতিতে L = 0 হলে N = 1 হয় (তার মানে logb1=0)। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লগারিদম নিয়ে কাজ করার মৌলিক নিয়মগুলো নেপিয়ারের সংজ্ঞার জন্যে প্রযোজ্য নয়। যেমন, গুণফলের লগারিদম আলাদা লগারিদমগুলোর যোগফল, এ কথাটি নেপিয়ারের সংজ্ঞায় খাটে না।**

**আর ১-১০-৭ যেহেতু ১ এর চেয়ে ছোট, তাই সংখ্যা বড় হতে থাকলে নেপিয়ারের লগারিদম ছোট হতে থাকে। আমাদের কমন লগারিদম (১০ ভিত্তিক) কিন্তু বাড়তে থাকে। তবে এই পার্থক্যগুলো তুলনামূলকভাবে সামান্য। এককটিকে ১০৭ উপএককে ভাগ করতে হবেই—নেপিয়ারের এই আপোসহীন ধারণারই ফসল এটি। দশমিক ভগ্নাংশের তাঁর এতটা মনোযোগ না থাকলে হয়ত তাঁর সংজ্ঞা আরও সরল হতো। আধুনিক সংগার কাছেও হয়ত১২।**

**একটু ভাবলেই বোঝা যায়, তাঁর এই উদ্বেগের ফলে অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়েই নেপিয়ার এমন একটি সংখ্যা আবিষ্কারের দোরগড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেটি তার এক শতক পরে লগারিদমের সার্বজনীন ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, গণিতে সে সংখ্যাটি পাই এর পরেই দ্বিতীয় সেরা অবদান রাখবে। এটিই হলো e। সংখ্যাটি (1+1/n)n এর লিমিট, n কে অসীম পর্যন্ত বিবেচনা করলে।**

**নোট ও তথ্যসূত্রঃ**

**(ইডিট+যোগ করতে হবে)**

**১।** As quoted in George A. Gibson, "Napier and the Invention of Logarithms,"

in Handbook of the Napier Tercentenary Celebration. or Modern

Instruments and Methods ofCalculation, ed. E. M. Horsburgh (1914; rpt. Los

Angeles: Tomash Publishers, 1982), p. 9.

**২। নামটা বিভিন্নভাবে দেখা যায়। যেমন নেপেইর, নেপার, নেইপার ইত্যাদি। সঠিক বানানটি সম্ভবত কারো জানা নেই। দেখুন** Gibson,"Napier and the Invention of Logarithms," p. 3.

**৩। এই পারিবারিক বংশধারা রেকর্ড করেন মার্ক নেপিয়ার নামে জনের একজন উত্তরপুরুষ।** Memoirs ofJohn Napier ofMerchiston: His Lineage. Life. And Times (Edinburgh, 1834).

**৪।**

**অনুবাদকের নোটঃ**

**\*১। আমরা বর্তমানে পাঠ্য বইয়ে বা দেয়ালে যেসব মানচিত্র দেখতে পাই সেগুলো।**

**\*২। --কে গাণিতিক অপারেশন বলে।**

**\*৩। নির্দিষ্ট একটি উদাহরণ চিন্তা করুন। ২২ × ২৩ = ৪** **× ৮ = ৩২ এবং ২২+৩=২৫=৩২।**

**\*৪। যে ধারার পরের পদ্গুলো আগের পদ্গুলো থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়তে বা কমতে থাকে সেটিকেই গাণিতিক অনুক্রম বা সমান্তর ধারা বলে। আর প্রতিটি পদের ঘাত বাড়তে থাকলে হয় জ্যামিতিক অনুক্রম বা গুণোত্তর ধারা। এরকম প্রক্রিয়াকে বাস্তবে জামিতিক বৃদ্ধি বলা হয়।**

**\*৫। -৮, ২, ৩, ১০,... ইত্যাদি হল পূর্ণ সংখ্যা। কিন্তু ভাবুন এক বার। ২ ও ৩ এর মাঝে কতগুলো সংখ্যা আছে? ২.১, ২.১১, ২.১১০,... এটা আসলে কখনোই শেষ হবে না। এমন সব সংখ্যাকেই বলা হয় অবিচ্ছিন্ন সংখ্যা।**

**৬। গুণ ও ভাগ যথাক্রমে যোগ ও বিয়োগ দিয়েই করা যাচ্ছে।**